পুঁজিবাদী শোষণের অবসানে প্রয়োজন বিপ্লব

অক্টোবর বিপ্লব শতবর্ষ উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি

অক্টোবর বিপ্লব শতবর্ষ উদযাপন কমিটি আয়োজিত উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও বামপন্থিদের ভূমিকাবিষয়ক আলোচনা সভা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেছেন, বর্তমানে দেশ পুঁজিবাদ ফ্যাসিবাদে পরিণত হয়েছে, এটা বিদায় করতে হলে বিপ্লব করতে হবে। বিপ্লব করতে হলে সুশৃঙ্খল সংগঠন ও জ্ঞানের প্রয়োজন হয়।

২২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোজাফ্‌ফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অক্টোবর বিপ্লব শতবর্ষ উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটির আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এ কথা বলেন। ‘উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ : জনগেণর আকাঙ্ক্ষা ও বামপন্থিদের ভূমিকা’ শিরোনামে আলোচনা সভাটির আয়োজন করা হয়।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, পূর্ববঙ্গ স্বাধীন হবে, সেটি স্পষ্ট হয়েছিল ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে। সেই অভ্যুত্থানটি ছিল প্রায় বিপ্লবী অভ্যুত্থান। এই আন্দোলনের অংশগ্রহণ করেছিল কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র সবাই। ছাত্ররাই এই আন্দোলনের চালিকাশক্তি ছিল। আলোচনা সভার মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। সভায় আরও বক্তৃতা করেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সভাপতি কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল–বাসদ এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, বাসদ (মার্কসবাদী)’র কেন্দ্রীয় পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, জাতীয় গণফ্রন্টের সমন্বয়ক টিপু বিশ্বাস, গবেষক নূর মোহাম্মদ, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি, কমিউনিস্ট লীগের অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের হামিদুল হক, গরিবমুক্তি আন্দোলনের আহ্বায়ক শামসুজ্জামান মিলন, বাসদ (মাহবুব)এর মহিনউদ্দীন চৌধুরী লিটন, সভা পরিচালনা করেন আব্দুল্লাহ কাফী রতন।

কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন, সমাজ পরিবর্তনের বিপ্লবটা আমাদের দেশে কীভাবে হবে? সে বিপ্লবের লক্ষ্যে তিন ধরনের ধারণা রয়েছে। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চল মুক্ত করে করে কেন্দ্র দখল করা; ভোটের মাধ্যমে চূড়ান্ত ক্ষমতা হাতে পেয়ে রাষ্ট্র ও সমাজের আমূল পরিবর্তণ করা; আরেকটি গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলেএনে রাষ্ট্র বিপ্লব সম্পন্ন করা। এখন সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য মাতামত হচ্ছে গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে বিপ্লব করা, এটাই প্রধান। তাই গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে যারা বিপ্লব করতে চান তাদের জন্য যে শিক্ষাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা হলো–১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭১ এর সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সিপাহি অভ্যুত্থান, ১৯৯০-এর গণ-অভ্যুত্থান থেকে বিশেষভাবে শিক্ষা নেয়া ও মূল্যায়ন কর। এজন্য ১৯৪৭-এ ভারত-পাকিস্তান ভাগ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত একটা পর্ব, ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৮ ও ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ এবং স্বাধীনতাত্তোর পরিস্থিতির উপর একটা অনুসন্ধান, পর্যালোচনা ও গবেষণা প্রয়োজন। এ আলোচনা অনুষ্ঠান সে লক্ষ্যে একটা উৎসাহ যোগাবে।

খালেকুজ্জামান বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন দু’টা ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। একটা ছিলো আপসকামী ধারা আরেকটা আপসহীন ধারা। আপসকামী ধারার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সোহরাওয়ার্দী আর আপসহীন ধারার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মওলানা আব্দুল হামীদ খান ভাসানী। এক পর্যায়ে আপসহীন ধারা দিকভ্রান্ত হয়ে পড়লো এবং আপসকামীতা প্রত্যাখ্যাত হয়ে পড়লে নতুন মোড়কে আপসকামী বিরুদ্ধবাদী ধারা মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে। ১৯৪৭ সালে ধর্মীয় দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত-পাকিস্তান ভাগ হলো। গড়ে ওঠলো পাকিস্তান জাতি ও ভারতীয় জাতি। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা ভারতীয় জাতিতে পরিণত হলো। কিন্তু পূর্ববঙ্গের বাঙালিরা পাকিস্তানি জাতি হতে পারলো না। কারণ ভৌগলিক দূরত্ব, ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, কেন্দ্রীভূত এক জাতীয় অর্থনীতি ইত্যাদি বৈপরিত্য ও পার্থক্য নিয়ে জাতিসত্ত্বা হয় না। সে জন্য ১৯৪৭ সালের পর পশ্চিম পাকিস্তানিরা হলো পাকিস্তানি জাতি, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ হলো ভারতীয় জাতি আর আমরা হয়ে পড়লাম জাতি পরিচয়হীন জনগোষ্ঠী। এই জাতি পরিচয়হীন জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভাষাআন্দোলনকে কেন্দ্র করে জাতি চেতনা গড়ে ওঠে। এই চেতনার পরিপূর্ণ বিকাশের ধারায়-ই স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা।

তিনি বলেন, ১৯৪৭-এর পর ধীরে ধীরে ছাত্র-যুবক, নারী-পুরুষ, কৃষক-শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী-পেশাজীবী মানুষের মননে পরিবর্তন ঘটতে থাকে; পরিবর্তন ঘটে অর্থনীতি-রাজনীতির ক্ষেত্রেও। ছাত্রদের আন্দোলনের সাথে শ্রমিকের আন্দোলন যুক্ত হয় আবার শ্রমিকের সাথে কৃষকের আন্দোলনও

যুক্ত হতে থাকে। বামপন্থিরা এই সমস্ত আন্দোলনের পটভূমি তৈরি করেছিলো। এর মধ্যে জাতি চেতনা, শ্রেণি চেতনা জাগ্রত হতে থাকে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পূর্বেও সমাজ বিভক্ত ছিলো–উপনিবেশিক শাসন-শোষণের অধীন একদিকে বাংলাভাষী ও আদিবাসী আপামর শোষিত জনগোষ্ঠী অন্যদিকে উঠতি বাঙালি ধনিকশ্রেণি। উভয়ের-ই মুক্তিকামনা এক স্রোতে মিলেছিলো। ধনিকশ্রেণির আকাঙ্ক্ষা ছিলো পাকিস্তানি ২২ পরিবারের জায়গায় নিজেদের প্রতিষ্ঠা করা আর শোষিত জনগোষ্ঠী চেয়েছিলো স্বাধীনতা প্রাপ্তি ও শোষণের চিরঅবসান। কিন্তু স্বাধীনতার নেতৃত্ব আওয়ামী লীগ দলের মাধ্যদিয়ে চলে গিয়েছিল উঠতি ধনিকশ্রেণির হাতে। ফলাফলে আজকের পরিস্থিতি।

খালেকুজ্জামান বলেন, ১৯৬৯ সালে আমি চট্টগ্রামের বাড়বকুণ্ডের একটি ক্যামিকেল কারখানার ট্রেড ইউনিয়নের নির্বাচিত সভাপতি ছিলাম। আমরা অংশ নিয়েছি এবং দেখেছি কীভাবে শ্রমিক আন্দোলন অভ্যুত্থানমুখী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক মতবাদিক বিতর্ককে কেন্দ্র করে ১৯৬৫ সালে ছাত্র ইউনিয়ন, ১৯৬৬ সালে কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য গণসংগঠনের বিভক্তির মধ্য দিয়ে সাংগঠনিকভাবে দুর্বল ও রাজনৈতিক দিক-নিশানা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরার ব্যর্থতায় পিছিয়ে পড়ে। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী শক্তি এগিয়ে যায় এবং নেতৃত্ব কব্জা করতে সক্ষম হয়।

১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান দেশকে স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করার মধ্য দিয়ে নেতৃত্বের বাস্তবতা ও ন্যায্যতা লাভ করে। বামপন্থি শক্তির কিছু অংশ তাত্ত্বিক বিভ্রান্তিসত্ত্বেও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে অনেক ক্ষয়ক্ষতি ও আত্মত্যাগ স্বীকার করে।

অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন, বর্তমান সময়ের সম্ভাবনা ও সমস্যা আমরা ’৭১-এর মাঝে খুঁজে পাব। সেই সময়ে অনেকগুলো দল, গোষ্ঠী, ব্যক্তি লড়াই করেছিল। একটা দল তাদের ভূমিকার ইতিহাস তুলে ধরছে কিন্তু অন্যদের ইতিহাস হারিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশের ইতিহাসে ষাটের দশকের আন্দোলন অনেক সমৃদ্ধ ছিল। ছাত্র-শ্রমিক, কৃষক-পেশাজীবী, নারীদের আন্দোলনের পাশাপাশি লেখক-সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব তারা সমাজমনন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

আইয়ুব খানের প্রধান অস্ত্র ছিল উন্নয়নের দশক। এই উন্নয়নের দশকে দিয়ে জনগণের কষ্ট, দুর্দশা সব আড়াল করার চেষ্টা করা হয়েছিল। এ বিষয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের কারাগারের রোজনামচায় বলা আছে ‘উন্নয়নের দশক চলছে, কিন্তু মানুষের নিপীড়ন, কষ্ট এসবের কোনো উল্লেখ নেই।’ এটা পড়ে মনে হয় যেন ২০১৭-১৮ সালে লেখা কথা।